ATMADEEP
An International Peer- Reviewed Bi- monthly Bengali Research Journal
ISSN: 2454–1508
Impact Factor: 4.5 (IIFS), 8.5 (IJIN)
Volume- II, Special Issue, April, 2026, Page No. 148-160
Published by Uttarsuri, Sribhumi, Assam, India, 788711
Website: https://www.atmadeep.in/
DOI: 10.69655/atmadeep.vol.2.specialissue.W.444

স্থপতির নির্দেশনা ও বন্ধকনামা: প্রাচীন ও মধ্যযুগীয় ভারতীয় ইষ্টক লেখমালা ভিত্তিক পর্যালোচনা

পিঙ্কি জানা, *গবেষক, প্রাচীন ভারতীয় ইতিহাস ও সংস্কৃতি বিভাগ, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়, পশ্চিমবঙ্গ, ভারত*

Received: 04.04.2026; Accepted: 08.04.2026; Available online: 10.04.2026
©2026 The Author(s). Published by Uttarsuri. This is an open access article under the CC BY license (https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)

Abstract

The history of ancient and medieval India is not merely a narrative of wars fought by kings and emperors, but rather a living document of the socio-economic transactions and architectural traditions of ordinary people. A careful examination of contemporary brick inscriptions (iṣṭaka-lekha), stone inscriptions, and copper plates reveals striking information about house construction guidelines and the evolution of mortgage deeds or systems of lending. The architect's instructions refer to directional guidelines for the proper construction of houses or buildings. A mortgage deed refers to a contractual agreement in which property is pledged as security during the taking or granting of a loan. The main objective of this research paper is to study brick inscriptions that contain such architectural instructions and mortgage-related records. However, scholarly engagement with ancient Indian brick inscriptions remains very limited, and further discussion on this subject is necessary.

Bricks (iṣṭaka) are one of the most important archaeological artifacts for understanding the technological knowledge of ancient people. Archaeological excavations have uncovered the remains of numerous brick-built structures, which undoubtedly indicate an urban civilization. Among these remains, some inscribed bricks serve as crucial archaeological evidence for reconstructing ancient Indian history. The tradition of engraving inscriptions on bricks in ancient India began during the post-Mauryan Shunga period and continued for a long time thereafter. These relatively fragile and decorative bricks, despite being exposed and unprotected in nature for centuries, are still legible today. This remarkable combination of technological knowledge and artistic skill in ancient Indian society truly evokes wonder.

A comprehensive study of brick inscriptions discovered in India has not yet been undertaken, though the subject demands further scholarly attention. I find this topic highly fascinating and have therefore pursued research in this field. Brick inscriptions related to architectural instructions and mortgage deeds have been discovered at Shorkot and Jaunpur. Discussion of these inscriptions outside their archaeological context is irrelevant; hence, it is essential to examine the nature of the archaeological sites in order to understand the true character of the inscriptions.

The inscriptions found at the above-mentioned sites will be analyzed in detail, and their content will be compared with other relevant archaeological and literary sources, prioritizing authentic evidence in the search for historical truth. This study will also explore the extent to which brick inscriptions contribute to understanding the socio-economic, political, religious, and cultural history of ancient India.

Keywords: Brick inscriptions, Archaeological artifact, Mortgage deed, Shorkot, Jaunpur, Lending system, Architect

আধুনিক ঐতিহাসিকগণ সাহিত্যিক ও প্রত্নতাত্ত্বিক উপাদানের ভিত্তিতে বিজ্ঞানসম্মতভাবে প্রাচীন ভারতীয় ইতিহাস চর্চায় নিয়োজিত হয়েছেন। কিন্তু এক্ষেত্রে সাহিত্যিক উপাদানের অপ্রতুলতার ত্রুটি লক্ষণীয়। এই ঘাটতি পূরণে তাৎপর্যপূর্ণ ভূমিকা পালন করে থাকে প্রত্নতাত্ত্বিক উপাদান (পুরাবস্তু, লেখ, মুদ্রা, স্থাপত্য-ভাস্কর্য)। আবার এই প্রত্নতাত্ত্বিক উপাদানগুলির মধ্যে লেখমালার গুরুত্ব সর্বাধিক। কারণ সাহিত্যিক ও অন্যান্য নানাবিধ তথ্যসূত্র থেকে প্রাপ্ত তথ্যাদি লেখ দ্বারা সমর্থিত হয়েই প্রকৃত ইতিহাসের মর্যাদা লাভ করে। তাই বলা যায় প্রাচীন ভারতীয় ইতিহাস চর্চার অন্যতম উপাদান হিসেবে লেখমালার অধ্যায়ন ব্যতীত ইতিহাস রচনা অসম্পূর্ণ। প্রাচীন ভারতে তাম্র, ব্রোঞ্জ, পিতল, লৌহ, স্বর্ণ, রৌপ্য, টিন ইত্যাদি ধাতু সহ টেরাকোটা সীল, মৃত্তিকা নির্মিত ফলক, ইষ্টক, মৃন্ময়-পাত্রাদি, কাষ্ঠদন্ড, পাটাতন, কাঁচ, হাতির দাঁত ও হার, কচ্ছপের খোল, প্রস্তরখন্ড, তোরণ, দ্বারদেশ, রেলিখ ক্যাসকেট ইত্যাদি উপাদানে লেখ খোদাই করা হত।[১] উক্ত লেখ খোদাইয়ে ব্যবহৃত সকল উপাদানের মধ্যে ইষ্টক হলো প্রাচীনকালের মানুষের প্রযুক্তিগত জ্ঞান সম্পর্কে অবগত হওয়ার অন্যতম প্রধান উপাদান। টি.এন.মিশ্রের মতে, প্রাচীন ভারতে মৌর্য পরবর্তী শুঙ্গ আমলে প্রবর্তিত ইষ্টক ফলকে লিপি উৎকীর্ণকরণের ঐতিহ্যের প্রবাহমানতা দীর্ঘকাল অব্যাহত ছিল।[২] প্রাচীন ভারতের প্রেক্ষাপটে ইষ্টক তথা ইষ্টক লেখ সম্পর্কিত গ্রন্থ বিরল এবং এ বিষয়ে কোনো পন্ডিত বিশেষ ভাবে আলোকপাত করেননি। ইষ্টক লেখ গুলির বেশিরভাগই ভগ্ন প্রায় ও অস্পষ্ট হওয়ায় লেখতে উপস্থাপিত লিপি সঠিকভাবে অনুধাবন করতে পারিনি। তাই এক্ষেত্রে গবেষণার অগ্রগতির লক্ষ্যে অধিকাংশ ক্ষেত্রেই অনুবাদ ভিত্তিক তথ্যসূত্রের উপর নির্ভর করতে হয়েছে। সম্ভবত রৌদ্রে শুকনো করতে দেওয়া ইষ্টকে পশু-পাখির পায়ের ছাপ দেখে মানুষের মনে প্রথম ইষ্টকে লিপি উৎকীর্ণকরণের ভাবনা আসে। ইষ্টকে লিপি উৎকীর্ণকরনের ক্ষেত্রে তিনটি পদ্ধতি অনুসরণ করা হতো। প্রথমত, স্ট্যাম্প বা ছাপ পদ্ধতি অর্থাৎ কোন অবয়বে ঋণাত্মক লিপি খোদাই করে সিক্ত ইষ্টকে ছাপ বা স্ট্যাম্প দিয়ে লিপি উৎকীর্ণকরণ। দ্বিতীয়ত, এনগ্রেভ বা খোদাই পদ্ধতি। তৃতীয়ত, স্ক্রাচ বা আঁচড় পদ্ধতি অর্থাৎ stilus জাতীয় যন্ত্রের সাহায্যে সিক্ত ইষ্টকে আঁচড় কেটে লিপি উৎকীর্ণকরণ।[৩] ভারতে প্রাপ্ত ইষ্টক লেখগুলিকে বিষয়বস্তুর বৈচিত্র্যতা ভিত্তিতে কয়েকটি বিভাগে ভাগ করে আলোচনা করেছি যথা- ধর্মীয়, দানমূলক, নামলেখ, বিবিধ (নানাবিধ উদ্দেশ্যে উতকীর্ণ ইষ্টক লেখ)। উক্ত বিভাগগুলির মধ্যে নানাবিধ উদ্দেশ্যে উতকীর্ণ ইষ্টক লেখ সম্পর্কে কিছুটা আলোকপাত করার চেষ্টা করেছি আমার এই গবেষণামূলক প্রবন্ধে। আমার গবেষণামূলক প্রবন্ধে জৌনপুর ও শোরকটে প্রাপ্ত ইষ্টক লেখগুলির প্রাপ্তি স্থানের গুরুত্ব, লেখগুলি উৎকীর্ণকরণের প্রেক্ষাপট, লেখ জারিকর্তার পরিচয়, ইষ্টকের পরিমাপ, ইষ্টকে উপস্থাপিত বক্তব্য ও তার সাথে সংশ্লিষ্ট বিষয় সমূহের বিশ্লেষণ করা হয়েছে এবং আর্থ-সামাজিক, রাজনৈতিক, সাংস্কৃতিক, ধর্মীয় ইতিহাস পুনর্গঠনে লেখগুলির অবদান কতটা ছিল তা অনুসন্ধান করেছি।

শোরকোট ইষ্টক লেখ:

১৮৭২-৭৩ খ্রীষ্টাব্দে আলেকজান্ডার ক্যানিংহাম বর্তমান পাকিস্থানের অন্তর্গত জাঙ জেলায় ৩০°৩০' উত্তর ও ৭২°২৪' পূর্বে অবস্থিত শোরকোটে প্রত্নতাত্ত্বিক অনুসন্ধান করে সর্বমোট পাঁচটি ইষ্টক লেখ আবিষ্কার

করেছিলেন। পরবর্তীকালে লেখ সম্বলিত ইষ্টক প্রাপ্তির আকাঙ্খায় তিনি পুনরায় ওই অঞ্চলে উৎখনন করেছিলেন কিন্তু ব্যর্থ হন, তবে তিনি অনুমান করেছিলেন ভবিষ্যতে এই অঞ্চলটি থেকে প্রচুর ইষ্টক লেখর সন্ধান পাওয়া যাবে। পাঁচটি ইষ্টক লেখতে উপস্থাপিত বক্তব্যের বিশ্লেষণধর্মী পর্যালোচনার পূর্বে লেখটির প্রাপ্তিস্থানের গুরুত্ব ও ইতিহাস আলোচনা আবশ্যক।

শোরকোটে প্রত্নতাত্ত্বিক উৎখননের ফলে সমতলভূমি থেকে ৪৩৩ ফুট উচ্চতায় স্থাপিত ১৮০০ ফুট দৈর্ঘ্য ও ১২০০ ফুট প্রস্থ ও ১০০ ফুট উচ্চতা বিশিষ্ট অগ্নিদগ্ধ ও রৌদ্রতপ্ত ইষ্টক নির্মিত একটি দূর্গের ধ্বংসাবশেষ সর্বসমক্ষে প্রতিভাত হয়। কিন্তু বর্তমানে দূর্গের ভূগর্ভস্থ গভীর আন্তঃভূমি ব্যতীত, দূর্গের কোনো ইমারতের ধ্বংসাবশেষ পরিলক্ষিত হয় না, কারণ বহু শতাব্দী পূর্বে শোরকোট শহরে বসতি বিস্তারের উদ্দেশ্যে গৃহ নির্মাণের জন্য দূর্গের সামগ্রিক ধ্বংসাবশেষ উৎখাত করা হয়েছিল। সমতলভূমি থেকে ৫০-৬০ ফুট গভীরতায় স্থিত দূর্গের ধ্বংসাবশেষ থেকে ইষ্টক নির্মিত বহু প্রাচীরের সন্ধান পাওয়া গেছে। এছাড়া উৎখননের ফলে জানা যায়, দূর্গটি চেনাব নদীর জলে পুষ্ঠ কৃত্রিমভাবে নির্মিত খাল দ্বারা পরিবেষ্ঠিত ছিল ও দূর্গের পূর্ব ও দক্ষিণদিকে দুটি প্রধান প্রবেশদ্বার ছিল বলেও অনুমিত হয়।[৪] আলোচ্য পাঁচটি ইষ্টক লেখ দুর্গটির দক্ষিণদিকে প্রবেশপথের সম্মুখে অবস্থিত অট্টালিকার অংশ ছিল।[৫] ক্যানিংহাম বলেছেন এই অঞ্চলের স্থাপত্যে অগ্নিদগ্ধ ইষ্টকের বহুল ব্যবহার থাকলেও কোনো পুরাতন ইষ্টক নির্মাণের চুল্লির দৃষ্টান্ত পাওয়া যায়নি। তবে তিনি অনুমান করেছিলেন, শোরকোট শহরের দক্ষিণ অংশে স্থিত ঢিবিগুলির ধ্বংসাবশেষ হিসাবে চিহ্নিত স্থানটি, যেটি বর্তমানে মুসলিম কবর স্থান হিসাবে পরিচিত, একদা এই স্থানটিতেই ইষ্টক নির্মাণ চুল্লি ছিল। তিনি লক্ষ্য করেছিলেন, প্রাচীন গুরুত্বপূর্ণ ইষ্টক নির্মিত নগরী হরপ্পা, ববন্নিতে কোনো ইষ্টক নির্মিত চুল্লি আবিষ্কৃত হয়নি কারণ সেখানকার স্থাপত্যগুলি সূর্যতপ্ত ইষ্টক দ্বারা নির্মিত হয়েছিল। তবে মুলতান, লাহোর ও আগ্রার শহরগুলিকে পরিবেষ্টিত করে ছিল বহুসংখ্যক সুউচ্চ ইষ্টক নির্মাণের চুল্লি, যা সেই অঞ্চলে সমীপবর্তী যাওয়ার জন্য গুরুত্বপূর্ণ আকর্ষণীয় বৈশিষ্ট্য ছিল। মূলতান ও শোরকোট দুটি স্থানেই ইষ্টকের বহুল প্রাচুর্যতা দৃষ্ট হয় এবং সেখানকার প্রত্যেকটি বাড়ি অগ্নিদগ্ধ ইষ্টক দ্বারা নির্মিত ছিল,[৬] তাই বলা যায়, এই অঞ্চলে ইষ্টক লেখ প্রাপ্তি অস্বাভাবিক নয় এবং ক্যানিংহাম যথার্থই বলেছেন পরবর্তীকালে প্রচুর ইষ্টক লেখ আবিষ্কার হতে পারে।

১৮৩১ খ্রীষ্টাব্দে বারনেস লাহোরে পরিভ্রমণের পথে শোরকোট পরিদর্শন করে বর্ণনা প্রদান করেছিলেন, তিনি বলেছিলেন শোরকোট পাকিস্থানের সিন্ধু বিধৌত অঞ্চলের নিকটবর্তী জম্মোরো জেলার অন্তর্গত একটি ঐতিহাসিক সমৃদ্ধ শহর, এছাড়াও তিনি শোরকোট সম্পর্কে বলেছিলেন, "a mound of earth, Surrounded by brick wall, and so high as to be seen for a circuit of 6 or 8 miles". প্রসঙ্গত তিনি উল্লেখ করেছেন শোরকোটে বসবাসকারী মানুষদের মধ্যে প্রচলিত বিশ্বাস অনুযায়ী, শোরকোটে রাজত্বকারী শোর নামে এক হিন্দু রাজা পূর্বোল্লিখিত দূর্গটি নির্মাণ করেছিলেন। কিন্তু শোরকোটের স্থানীয় মুসলিমরা দাবি করেছিলেন, সুফি তাজউদ্দিন শরকোটির নামে শোরকোট শহরের নামকরণ করা হয়েছিল এবং বিশেষ শ্রদ্ধা জ্ঞাপন বশতঃ দূর্গের সর্বোচ্চ স্থানে তাঁকে সমাহিত করা হয়েছিল। অনেকের মতে সুফির উপাধি শোরি বা শরকোটি ওই স্থানের নাম থেকে উদ্ভূত হয়েছিল। আবার এই ফকিরকে প্রকৃত মুসলমান আক্রমণকারী বলা হয়, যিনি দূর্গ দখল করার জন্য নিহত হয়েছিলেন এবং পরবর্তীকালে শহীদ রূপে প্রভূত সম্মান প্রাপ্ত হয়েছিলেন। ব্রাহ্মণ্যসাহিত্য অনুযায়ী, দূর্গস্থানটির প্রকৃত নাম Shivangari অথবা Sheopur, যা পরবর্তীকালে সঙ্কুচিত হয়ে 'Shor' হয়ে গিয়েছিল।[৭]

তবে শোরকোটের প্রকৃত অবস্থান নিয়ে নানান মতবাদ কথিত রয়েছে। ভি.এস.আগরওয়াল পাণিনির অষ্টাধ্যায়ীতে প্রদত্ত বর্ণনা অনুসরণ করে বলেছিলেন, বাহ্লিক দেশ-কেকয়, উশিনারা, মদ্র, শবস ইত্যাদি

প্রদেশে বিভক্ত ছিল। কেকয় ও শবস ঝিলাম ও চেনাব নদীর মধ্যবর্তীস্থানে এবং মদ্র ও উশিনারা চেনাব ও রাভী নদীর মধ্যবর্তীস্থানে অবস্থিত ছিল। দিব্যবদানে উল্লিখিত হয়েছে, শবস উত্তরাপথের কেন্দ্রস্থল তক্ষশিলার নিকটে অবস্থিত, এই শবস এর বর্তমান নাম চিব, এই শবস উপজাতিরা শিবস নামে পরিচিত ছিল। আবার উশিনারা প্রদেশ শিবস উপজাতির সঙ্গে সম্বন্ধযুক্ত এবং শিবস উপজাতির মুখ্য শহর শিবিপুরকে শনাক্ত করা হয় জাঙ জেলার শোরকোটের সঙ্গে।[৮] বি .কে.মাথুর ও বি.এস.ধিলোন একমত হয়ে বলেছিলেন প্রাচীন শহর শিবিপুর বা শিবরাষ্ট্র পাকিস্থানের জাঙ জেলার শোরকোটে অবস্থিত ছিল অর্থাৎ শিবিপুর শোরকোটের প্রাচীন নাম ছিল।[৯] এপ্রসঙ্গে আলেকজান্ডার ক্যানিংহাম উল্লেখ করেছিলেন, Xuan Zang পাঞ্জাবের প্রধান জেলাকে পো-ফা-টো অথবা পো-লো-ফা-টো নামে অভিহিত করেছিলেন। তবে পাঞ্জাবের রাজধানী মূলতানের ৭০০ লি বা ১৭৭ মাইল উত্তরপূর্বে অবস্থিত ছিল, এটি চেনাব নদীর তীরবর্তী জাঙ জেলার একেবারে নিকটে অবস্থিত ছিল। Xuan-zang উল্লিখিত পো-লো-ফা-টো চৈনিক শব্দটি পরিবর্তিত হয়ে সো-লো-ফা-টো অথবা সোরাবতি হয়, যা শোরকোটের সমার্থক। ক্যানিংহাম মনে করেন, আলেকজান্দ্রিয়ার সেরিআনেতে শোরকোট অবস্থিত ছিল, কারণ গ্রীক বীর আলেকজান্ডার, ফিলিপকে তার রাজ্য ওক্সুদ্রকল ও মল্লির স্থানীয় শাসক নির্বাচন করেছিলেন। ফিলিপ তাঁর রাজ্য শোরকোট পর্যন্ত বিস্তৃত করেছিলেন ও তাঁর সময়ে শোরকোট ছিল অভেদ্য এবং সরাসরি আলেকজান্দ্রিয়ার মূল যোগাযোগ পথের সাথে সংযুক্ত। এই পথটি আবার হিদাসপাসের আকসিন থেকে মল্লির রাজধানী পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল। তাই ক্যানিংহাম শোরকোটকে মল্লি শহরের সাথে সংযুক্ত করেছিল, এর সপক্ষে যুক্তি উপস্থাপন করে বলেছেন, আলেকজান্ডার যখন মল্লি দখলের অভিযান করেছিল তখন তাঁর তিনভাগে বিভক্ত সৈন্যদলের মধ্যে তাঁর নির্দেশে শাসক হেপসেসনের নেতৃত্বে এক সৈন্যবাহিনী সরাসরি শোরকোটের মধ্যে দিয়ে মূলতানের দিকে অগ্রসর হয়েছিল অর্থাৎ শোরকোট নিশ্চিতভাবে মল্লির রাজধানী ছিল। অধ্যাপক এগারমেন্ট বলেছেন, শোরকোটের দূর্গ বা ঢিবি জাঙ জেলার চেনাব, সিন্ধ ও রাভী নদীর মধ্যবর্তী স্থানে অবস্থিত শিবিপুরকে উপস্থাপিত করে, শিবিদের এই শহরের কথা শোরকোট প্রস্তর লেখতে উল্লেখিত রয়েছে। এমনকি বর্তমানে শিবি অথবা শিবিরা পাঞ্জাবের বিখ্যাত জাঠ উপজাতি।[১০]

বারনেস বলেছেন শোরকোটের উৎখননে প্রাপ্ত প্রত্নসামগ্রীর মধ্যে রাজা অ্যাপোলোডোটাসের মুদ্রাসহ ইন্দোস্কিথিয়ান মুদ্রা ও সকল মুসলমান শাসক ও হিন্দুরাজাদের মুদ্রাগত সাক্ষ্য দেখে সহজেই এই অঞ্চলের প্রাচীনত্ব প্রমাণিত হয়। এছাড়া ত্রিষ্টাল, অ্যাজেট, কর্ণেলিয়ান ও জ্যাসপার, লাপিস লাজুলি ইত্যাদি প্রস্তরখন্ড দ্বারা নির্মিত গোলাকার ও সমতল আকৃতিবিশিষ্ট পুঁতি পাওয়া গেছে, এই প্রত্নতাত্ত্বিক বস্তুগুলিই বারনেসের বক্তব্যের সপক্ষে সহকারী প্রমাণ স্বরূপ। শোরকোটে প্রাপ্ত সবচেয়ে আকর্ষণীয়, মৌলিক ও অদ্বিতীয় বৈশিষ্ট্য সম্বলিত প্রত্নসামগ্রী হল ছাঁচে ঢালাই করা বিভিন্ন শৈলীযুক্ত অগ্নিদগ্ধ ইষ্টকগুলি, ৬ ইঞ্চি-৮ ইঞ্চি দৈর্ঘ্যবিশিষ্ট এই ইষ্টকগুলির অলঙ্করণশৈলী দৃষ্টি আকর্ষণ করে। মোটামুটিভাবে আটধরণের শৈলীর উল্লেখ করেছেন ক্যানিংহাম। প্রথমত, 'diaper pattern' নামে এক শৈলী শোরকোটে প্রাপ্ত ইষ্টকের কিনারায় পরিলক্ষিত হয়, এই শৈলীর প্রাচীনতম নিদর্শন পাওয়া যায় আদিনা মসজিদে। দ্বিতীয়ত, ১৪ ৭/৮"x১০"x১ ১/২" আয়তনবিশিষ্ট কালো হলুদ বর্ণের ইষ্টকে vitrified Pattern নামে শৈলী দেখা যায় এবং এই ধরণের ইষ্টকগুলি শোরকোটের দূর্গের ভূগর্ভ থেকে উদ্ভূত হয়। তৃতীয়ত, গাঢ় নীল বর্ণের vitrified শৈলীতে নির্মিত ইষ্টকের ওপর ধারালো পাত্র দ্বারা অলঙ্করণ করা হত। চতুর্থত, vitrified শৈলীযুক্ত কালো রঙের ইষ্টক, এইধরণের ইষ্টকের ওপর হাতির শুঁড়সহ মস্তক খোদিত হয়েছিল। পঞ্চমত, ইষ্টকের সম্মুখভাগে বন্ধনী চিহ্ন যুক্ত শৈলী দেখা যায়। ষষ্ঠত, ইষ্টকে 'Sunken Squar' শৈলীটি দেখা যায়। সপ্তমত, 'Leaf Pattern' নামে

শৈলীটি দেখা যায় ইষ্টকের ওপর, এই ইষ্টকগুলি সাধারণত ১৩"x৮ ১/২"x৩" আয়তনবিশিষ্ট। অষ্টমত, ছাঁচে ঢালাই করার সময় দুটি রেখার দাগ বিদ্যমান, ছোট দৈর্ঘ্যবিশিষ্ট ২ ৩/৪" পুরু .[১১]

পূর্বোক্ত শৈলীযুক্ত ইষ্টকগুলির নির্মানকালে কিছু ইষ্টকে লেখ খোদাই করা হয়েছিল, তার মধ্যে মাত্র পাঁচটি ক্ষুদ্র লেখ সম্বলিত ইষ্টক শোরাকোটের দূর্গের ভূগর্ভস্থ স্থান থেকে উদ্ধার করা হয়েছিল। যদিও মনে করা হয়, লেখতে উৎকীর্ণ বক্তব্য সাধারণভাবে একজন ইষ্টক নির্মাণকারক বা রাজমিস্ত্রির কর্মকান্ড ব্রাহ্মীলিপি ও প্রাকৃত ভাষায় খোদিত লিপিগুলির লিপিতাত্ত্বিক বৈশিষ্ট্য পর্যালোচনা করে জানা যায়, এগুলি ইন্দোস্কিথিয়দের সময়কাল থেকে গুপ্তযুগের মধ্যবর্তী সময়কালে উৎকীর্ণ করা হয়েছিল। অর্থাৎ ৫০-১৫০ খ্রীষ্টাব্দে স্থাপন করা যায়। তবে লেখগুলির পাঠোদ্ধারকর্তার নাম জানা যায় না।

i) প্রথম ইষ্টক লেখঃ- ১৩ ১/২ ইঞ্চি দৈর্ঘ্য, ১০ ৩/৪ ইঞ্চি প্রস্থ ও ২ ১/২ ইঞ্চি পুরু আয়তন বিশিষ্ট শোরকোট ইষ্টক লেখটি তিনটি সারিবিশিষ্ট। লেখটির মূল পাঠঃ- "Pala 8 a: Chaturddasmika 14". অর্থাৎ ১৪ নং ইষ্টকটি ৮ নং কক্ষে স্থাপন করতে হবে।[১২]
চতুষ্কোণাকৃতি আলোচ্য ইষ্টকটির এককোণের ২ ১/২ ইঞ্চি গভীর অংশ বাদ দেওয়া হয়েছিল। সাধারণভাবে মনে করা হয়, এটি লেখ সম্বলিত ইষ্টকটির একটি নকশা। এছাড়াও এই লেখযুক্ত ইষ্টকটি নির্দিষ্ট স্থানে স্থাপন করার জন্য নির্মিত হয়েছিল। সম্ভবত গৃহনির্মাণের তত্ত্বাবধায়ক রাজমিস্ত্রিকে কাজের পথপ্রদর্শন করতে লেখটি ইষ্টকে উৎকীর্ণ করান। এরকম বৈচিত্রযুক্ত লেখসম্বলিত ইষ্টক প্রাচীন ভারতীয় ইতিহাসে অদ্বিতীয় এবং ইষ্টক লেখটি একটি অতিমূল্যবান প্রামাণ্য দলিল হিসাবে অবিস্মরণীয়।

ii) দ্বিতীয় শোরকোট ইষ্টক লেখঃ- প্রথম ইষ্টক লেখটির দৈর্ঘ্যের একতৃতীয়াংশ আয়তনবিশিষ্ট বর্তমান লেখ সম্বলিত ইষ্টকটির নিম্নাংশ নির্দেশ অনুসারে কেটে বাদ দেওয়া হয়েছিল। কারণ নির্দিষ্ট ইষ্টকযুক্ত শৈলীটি অট্টালিকার সঠিক স্থানে স্থাপনের জন্য ও রাজমিস্ত্রিকে এইধরণের নির্দিষ্ট চিহ্নের মাধ্যমে সংকেত প্রদান করতে আলোচ্য ইষ্টকে লেখ খোদাই করা হয়েছিল, কারণ যাতে অন্যান্য ইষ্টকের সাথে বিশেষ ইষ্টকটি মিশে না যায়, যদি ইষ্টকে লেখ উৎকীর্ণকরণের মাধ্যমে রাজমিস্ত্রিকে নির্দেশ না করা হত, তাহলে রাজমিস্ত্রি সঠিকভাবে ওই নির্দিষ্ট স্থানে লেখটি স্থাপন করতে অসফল হত। সুতরাং এই বিশেষ শৈলীযুক্ত ইষ্টকটি স্থাপত্যের কোথায় স্থাপন করতে হবে তা নির্দেশ করতেই সম্ভবত লেখটি উৎকীর্ণ করা হয়, কারণ এই শৈলীযুক্ত ইষ্টকটি এমনভাবেই নির্মিত হয়েছিল যে ওই নির্দিষ্ট স্থান ব্যতীত অন্য কোন স্থানে স্থাপন করা সম্ভব নয় সারিবিশিষ্ট দ্বিতীয় ইষ্টক লেখটির মূল পাঠ, ১. "Dakshina Paschem kundala ২. Vadaka Chaturthika 4"[১৩]
অর্থাৎ একটি গোলাকার অট্টালিকার দক্ষিণ-পশ্চিম অংশের চতুর্থ স্তরে আনুভূমিকভাবে ছাঁচে ঢালাই করা ইষ্টকটি দৃঢ়ভাবে স্থাপন করতে হবে। এখানে 'Vadaka' বলতে আনুভূমিক ছাঁচকে বোঝানো হয়েছে।

iii) তৃতীয় শোরকোট ইষ্টক লেখঃ- ১০ ১/২ ইঞ্চি বর্গাকার ও ৩ ১/২ ইঞ্চি পুরু বর্তমান ইষ্টক লেখটির একটি কোণে বক্রভাবে ৪ ইঞ্চি গভীরে অংশ বাদ দেওয়া হয়েছে, এবং ইষ্টকের উপরিভাগে দুটি সারিবিশিষ্ট ইষ্টকটির মূলপাঠ- ১। "Isrimulasya ২। Kundalekavalta"[১৪]
অর্থাৎ ইশরি মূল অট্টালিকার মালিক ছিলেন এবং বলা হয়েছে আনুভূমিক ছাঁচ নির্মিত ইষ্টকগুলি একটি নির্দিষ্ট স্তরে স্থাপন করা হয়েছিল। সুতরাং দূর্গের নিকটে অট্টালিকার নির্মাতা ছিলেন ইশরিমূল।

iv) চতুর্থ শোরকোট ইষ্টক লেখঃ- ১০ ১/২ ইঞ্চি বর্গাকার ও ৩ ১/২ ইঞ্চি পুরু আয়তন বিশিষ্ট বৃহৎ ইষ্টকটির সম্মুখভাগ বাঁকানো ও অর্ধলেখযুক্ত। দুটি সারিবিশিষ্ট ইষ্টক লেখটি ক্ষয়প্রাপ্ত ও অস্পষ্ট হলেও লেখটির বামদিকের অংশটি স্পষ্ট।

v) পঞ্চম শোরকোট ইষ্টক লেখঃ- আলোচ্য লেখটি চতুর্থ লেখটির অনুরূপ হওয়ায়, চতুর্থ লেখটি, পঞ্চম লেখটির দ্বারা পুনর্গঠিত হয়, দুটি সারিবিশিষ্ট লেখটির মূল পাঠঃ- ১। Pamadwi ২। Saptotika 'saptotika' বলতে বোঝায় সওর সংখ্যা, তবে 'Pamadwi' শব্দটির অর্থ জানা যায় না, তবে লেখটি পড়ে অনুমিত হয় শব্দগুলি অট্টালিকার সঙ্গে যুক্ত।[১৫]

সবশেষে বলা যায়, এটি একটি রীতি ছিল, ইষ্টক নির্মাতা কর্তৃক কোনো নির্দিষ্ট প্রস্তর বা ইষ্টক খন্ডে লেখ খোদাই করে গৃহ নির্মাতাকে নির্দেশ প্রদান করা, বাস্তবে এই শৈলী বিশেষ কার্যকারী ও প্রয়োজনীয়। কারণ প্রাচীনভারতে আর অন্য কোনভাবে রাজমিস্ত্রিকে নির্দেশ প্রদান করার উপায় ছিল না, একারণবশতঃ বলা যায়, আলোচ্য গুরুত্বপূর্ণ ও মৌলিক বৈশিষ্ট্যসম্পন্ন এই লেখগুলি প্রাচীন ভারতীয় মানুষের প্রযুক্তিগত জ্ঞান সম্পর্কে জানার একটি অন্যতম উপাদান ও তৎকালীন সাংস্কৃতিক ইতিহাস পুনর্গঠনে মূল্যবান অনন্য দলিল স্বরূপ।

জৌনপুর ইষ্টক লেখঃ-১৮৫০ খ্রীষ্টাব্দের কিছু বছর পূর্বে উত্তরপ্রদেশের বারাণসী বিভাগের অন্তর্গত গোমতী নদীর তীরে ২৫°৭৬' অক্ষাংশ এবং ৮২°৬৪' দ্রাঘিমাংশে অবস্থিত জৌনপুর জেলার অন্তর্ভুক্ত একটি গ্রাম থেকে ক্যাপ্টেন এম.কিট্টেও ১২১৭ খ্রীষ্টাব্দে উৎকীর্ণ ১ ফুট ৩ ইঞ্চি দৈর্ঘ্যx১ ফুট প্রস্থx৩ ইঞ্চি পুরু আয়তন বিশিষ্ট একটি বৃহৎ লেখসম্বলিত ইষ্টক আবিষ্কৃত করেছিলেন। এর কিছুকাল পরে লেখতাত্ত্বিক হিরানন্দ শাস্ত্রী লেখটির প্রকৃত পাঠের অবিকল প্রতিলিপি রচনা করেছিলেন এবং জেমস বল অ্যাটাইন ১৮৫০ খ্রীষ্টাব্দে লেখটির অনুবাদ journal of Asiatic society of Bengal Vol- XIXপ্রকাশিত করেছিলেন।[১৬] লেখটির আবিষ্কার আদিমধ্যযুগের শেষপর্বে উত্তরপ্রদেশের অর্থনৈতিক তথা সাংস্কৃতিক ইতিহাসে এক নব দিগন্ত উন্মোচন করে। এছাড়া স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্যসূচক লেখটির পুঙ্খানুপুঙ্খ বিশ্লেষণের মাধ্যমে আদিমধ্যযুগীয় ভারতবর্ষের ইতিহাসে লেখটির গুরুত্ব সম্পর্কে আলোচনায় ব্রতী হলাম।

নাগরী লিপি ও সংস্কৃত ভাষায় উৎকীর্ণ লেখটির মূল পাঠ হল-

> "স্বস্তি সম্বত ১২৭৩ আষাঢ় শুদি ৬ রবৌ। অদ্যেহ ময়ূনসর্য্যা ধনিকৌ নাম্মা মতৌ। রা শ্রী র(মহ) রা শ্রীমহাদিত্যৌ। রা ভোবিসুত্যে স্বনং। অতসসকাশাদ্ধারণিকৌ নাম্মা মতঃ রা গংগদেবো রাধানুসুতঃ ষদ্বোদ্দিক দ্রম্ম সহস্রদ্বয় সার্দ্ধ শতদ্বয়ং গৃক্ষাত্যুদ্ধারেনঙ্কপি দ্র ২২৫০ অমীষাং দ্রম্মাণং বিশ্বাসার্থং চ প্রবাপিণী স্বকপট্টিকা বন্ধকে প্রদত্তা।। অস্মিন পত্রে চৌদ্ধারণিক হস্তেন স্বমত মারোপয়তি মতং মম। অত্রাপ্তে রানক শ্রীবাঘদেবঃ।। রাজোপরোহেণ রাদেবাদিত্য রাধৌরি রাকুমনপাল রাবিলাম রাপ্রজয়ন এতো সাক্ষিণঃকৃতা পুতাশ্চ লিখিতং বেদমুভয়ানুমতেন ঢিবাশ্রী সোডলেন ডিবাহাট পুত্রেন দিগ্ধাক্ষর মবিবৃত্তাক্ষরং বা ততোপি প্রমাণমিতি।"[১৭]

অর্থাৎ পবিত্র মঙ্গল সূচক স্বস্তি শব্দ দিয়ে সূচিত আলোচ্য লেখটির মূল বক্তব্য ১২৭৩ (১২১৭ খ্রীষ্টাব্দ) সম্বত এর আষাঢ় মাসের ষষ্ঠ তারিখে রবিবারে ময়ূরনগরীতে রা ডোবির দুই পুত্র রা শ্রী বহম ও রা শ্রী মহাদিত্য নামে দুই মহাজন (ঋণদাতা) বা ধানুর পুত্ররা গঙ্গদেবকে ২২৫০ টি ষড বোড্ডিক দ্রম্ম মুদ্রা ঋণবাবদ প্রদান করেছিলেন। এই ঋণদানের সাক্ষ্য বা প্রমাণ স্বরূপ আলোচ্য ইষ্টক লেখটি ঋণপত্র হিসাবে উৎকীর্ণ করা হয়েছিল। লেখটিতে স্পষ্টভাবে ঘোষিত হয়েছে, যথাসময়ে ঋণ পরিশোধ করার অঙ্গীকার হিসাবে ও ঋণগ্রহণ করার দরুণ, ঋণগৃহীতা তাঁর নিজস্ব উর্বর কৃষিভূমি ঋণদাতার নিকট বন্দক রেখেছিলেন, এই শর্ত সাপেক্ষে যে, জমির উৎপন্ন ফসল ঋণদাতা উপভোগ করবে। ঋণগৃহীতা সমস্ত শর্ত রক্ষার্থে প্রতিশ্রুতি পালনের জন্য নিজ হস্তে ঋণদানপত্রে স্বাক্ষর করেছিলেন। এই টাকা আদান-প্রদানের ক্ষেত্রে শ্রী রানক বাঘদেব রাজার

সাথে শর্তে আবদ্ধ ছিলেন। এই ঋণদান চুক্তিপত্রটির সুরক্ষা বিধানের জন্য নির্দিষ্ট যোগ্যতাসম্পন্ন উত্তম চরিত্রের ন্যায়পরায়ণ সাক্ষ্যদানকারীরা রাজা কর্তৃক প্রদত্ত আইনের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয়ে, ঋণগ্রহীতার পক্ষ থেকে জামানতকারী হিসাবে সাক্ষর করত। রা দেবদিত্য, রা ধৌরি, রা কুমারপাল, রা বিলাস এবং রা প্রজায়ন প্রমুখ জামানতকারী বা সাক্ষ্যদানকারী ব্যক্তি অঙ্গীকার করেছিল ঋণগ্রহীতা বা গঙ্গদেব যথাসময়ে ঋণপরিশোধ না করতে পারলে, তারা দায়ী থাকবে। তবে লেখতে স্পষ্টভাবে উল্লেখ নেই যে, রনক শ্রী বাঘদেব রাজকীয় কর্তৃপক্ষ না প্রাদেশিক শাসক ছিলেন। তবে নিশ্চিতভাবে বলা যায় আলোচ্য ঋণদান পত্রটি তার তত্ত্বাবধানে রচিত হয়েছিল। উভয়পক্ষের সম্মতিতে ঋণদান পত্রটি খোদাই করেছিলেন ডিবাহাতর পুত্র ডিবাশ্রী সোডল।

লেখটির প্রাপ্তিস্থান জেমস বল অ্যাটাইন বলেছেন, ইষ্টক লেখটি বন্ধকী কৃষিভূমির মৃত্তিকা গর্ভ থেকে উদ্ধৃত হয়েছিল। খুব সম্ভবত সকলের জ্ঞাতার্থে বন্ধকী ভূমিতে কোনো ইষ্টকের স্থাপত্য নির্মাণে লেখসম্বলিত ইষ্টকটি ব্যবহৃত হয়েছিল। আলোচ্য ইষ্টক লেখটিতে উল্লিখিত হয়েছে, ময়ূনগরীতে চুক্তিপত্রটি রচিত হয়েছিল। এর থেকে অনুমিত হয় বন্ধকীভূমি এই ময়ূনগরীর অন্তর্ভুক্ত এবং লেখতে বর্ণিত সকল ব্যক্তি এই অঞ্চলের বাসিন্দা। তাহলে একথা বলা যায়, জৌনপুরের যে গ্রামটি থেকে লেখটি আবিষ্কৃত হয়েছিল, তার প্রাচীন নাম ছিল ময়ূনগরী এবং একমাত্র এই লেখটি থেকেই জানা যায় জৌনপুরের অন্তর্গত ময়ূনগরী নামে একটি গ্রাম ছিল। কিন্তু এম.কিট্টেও প্রাচীন ময়ূনগরীকে বর্তমান কোনো স্থানের সাথে শনাক্ত করেননি এবং লেখটির সার্বিক প্রাপ্তিস্থান সম্পর্কেও কোনো আলোকপাত করেননি। এপ্রসঙ্গে ভি.এস.আগরওয়াল বলেছেন, ময়ূ একটি সংস্কৃত শব্দ, উত্তরপ্রদেশের অন্তর্গত কোনো স্থানের নামের শেষে ময়ূ শব্দটি ব্যবহৃত হতে দেখা গেছে যেমন- 'মক্ত', ওধ ও তার পার্শ্ববর্তী জেলায় স্থানের নামের শেষে পরিলক্ষিত হয়। জৌনপুরের সিনগ্রাময়ু অঞ্চলে আজমগড়ের ময়ু, উনত্ত এর বক্তারময়ু, এলাহাবাদের ফাফামায়ু, বন্দরময়ু, ঝাঁসিরময়ুতহমিল ও ইন্দোরের ময়ু ইত্যাদি নামের স্থানের পরিশেষে ময়ু শব্দটি লক্ষণীয়। তিনি দেখিয়েছেন, ব্যাকরণ সাহিত্যে 'মায়ুক' শব্দটি স্থানের নামের শেষে রয়েছে, যেমন- আপ্রীতাস অথবা আফ্রিডিস এর অন্তর্গত আপ্রীতমায়ু শহর। উপরিউক্ত বক্তব্যের নিরিখে বলা যায়, ময়ূনগরী প্রকৃত স্থানের নাম নয়, 'ময়ু' শব্দটির পূর্বে কোনো শব্দ ছিল যা খোদাইকারক ভুলবশতঃ খোদাই করেননি আলোচ্য লেখটিতে।[১৮]

আলোচ্য ইষ্টক লেখর রনক শ্রী বাঘদেব সম্ভবত প্রাদেশিক শাসনকর্তা ছিলেন। কারণ ১২১৭ খ্রীষ্টাব্দে দিল্লি সালতানাতের প্রকৃত প্রতিষ্ঠাতা ইলতুতমিস সমগ্র ভারতবর্ষের সার্বভৌম শাসনকর্তা হিসাবে দিল্লিকে এক সুশৃঙ্খল ও সংঘবদ্ধ রাষ্ট্র হিসাবে এক সূত্রে গ্রোথিত করে, কেন্দ্রীয় শাসনের গোড়াপত্তন করেন। কিন্তু সুলতানি আমলে দিল্লির নিকটবর্তী অঞ্চল কেন্দ্রীয় সরকারের এলাকাধীন ছিল, এবং এই অঞ্চলে সুলতান স্বয়ং শাসন করতেন।[১৯] তাই কেন্দ্রীয় সরকারের বাইরে বিরাট অঞ্চলকে প্রায় কুড়িটি বা পঁচিশটি প্রদেশে ভাগ করা হয়েছিল, এইসকল প্রদেশের শাসনকর্তা নিযুক্ত হতেন 'নায়েব সুলতান' নামে পদাধিকারী রাজকীয় পরিবারের অন্তর্ভুক্ত ব্যক্তি অথবা বিশ্বস্ত উচ্চপদস্থ অভিজাত। নায়েব সুলতানরাও প্রদেশে সুলতানের মতোই ক্ষমতা ভোগ করতেন কিন্তু তাঁরা সার্বভৌম শাসক ছিলেন না, দিল্লির সুলতানের প্রতি আনুগত্যই তাদের এপদে বহাল থাকার প্রধান শর্ত। সুলতানি আমলে প্রাদেশিক শাসন কাঠামোর এক গুরুত্বপূর্ণ অঙ্গ হিসাবে সূত্রপাত ঘটে ইক্তা ব্যবস্থা বা প্রথার, এই প্রথার প্রচলনকর্তা ছিলেন ইলতুতমিস। তাঁর এই ব্যবস্থা কার্যকরী করার প্রধান উদ্দেশ্য ছিল কেন্দ্রীয় শাসনের সঙ্গে দূরবর্তী অঞ্চলের যোগসূত্র সুদৃঢ়ভাবে স্থাপন করা। নির্দিষ্ট অঞ্চলে এক একজন শাসকের রাজস্ব আদায় করার অধিকার সুলতান কর্তৃক প্রদত্ত হয়েছিল, এইরকম স্বত্ব নিযুক্ত ভূভাগীয় এককে ইক্তা বলা হত। কোনো কোনো ঐতিহাসিক প্রদেশগুলিকে ইক্তা বলে অভিমত প্রকাশ

করেছেন। প্রতিটি ইক্তার শাসক 'মুক্তি' নামে প্রায় স্বাধীন এক সামরিক কর্মচারী ছিলেন, এছাড়াও তারা রাজস্বর আদায় ও তৎসহ প্রশাসনিক দায়দায়িত্ব পালনে অঙ্গীকারবদ্ধ ছিলেন এবং আদায়কৃত রাজস্ব প্রশাসনিক খরচ বাদে, উদ্বৃত্ত রাজস্ব কেন্দ্রকে পাঠাতে হত। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে ইক্তার মালিক ছিলেন সুলতান, মুক্তি সম্পূর্ণভাবে তাঁর ইচ্ছা ও অনিচ্ছার ওপর নির্ভরশীল ছিল। তবে শক্তিশালী ও উচ্চাকাঙ্খী কিছু প্রাদেশিক কর্তা এবং রাজপ্রতিনিধিরা[২০] দিল্লির সুলতানদের দুর্বলতার সুযোগ নিয়ে কোনো না কোনো সময়ে স্বাধীনতা ঘোষণা করে, নিজস্ব মুদ্রা প্রচলন করেছিল। মুদ্রাগত সাক্ষ্য থেকে জানা যায়, বাংলা, গুজরাট, মালব, জৌনপুর ও কাশ্মীর স্বাধীন রাজ্য ছিল।[২১] তবে সুলতান ইলতুতমিসের সময় জৌনপুর স্বাধীন রাজ্যে পরিণত হয়েছিল কিনা যথাযথ তথ্যের অভাবে নিরূপণ করা সম্ভবপর নয়। তাই রনকশ্রী বাঘদেব স্বাধীন রাজ্যের রাজা ছিলেন না ইক্তাদার বা মুক্তি না প্রাদেশিক শাসক ছিলেন, তা প্রয়োজনীয় তথ্যের অভাবে সঠিকভাবে বলা সম্ভব নয়। তবে একথা নিঃসন্দেহে বলা যায় লেখটির প্রাপ্তিস্থান জৌনপুরের অন্তর্গত ময়ূনগরী (মাউ) সুলতানের প্রাদেশিক শাসনের আওতাভুক্ত এক বিশেষ অঞ্চল ছিল।

শ্রী রনকবাঘদেব ব্যতীত লেখতে প্রদত্ত প্রত্যেক ব্যক্তির নামের পূর্বে 'রা' শব্দটির বহুল ব্যাবহার লক্ষ্যণীয়, এই 'রা' হল রাজপুত বা লেখপদ্ধতি অনুসারে রাজপুত্রের সংক্ষিপ্ত রূপ, কিন্তু আলোচ্য লেখটির ক্ষেত্রে এ বক্তব্য প্রযোজ্য নয় কারণ যদি 'রাত' বলতে রাজপুত্র বোঝাত, তাহলে শ্রী বাঘদেবের নামের পূর্বে অবশ্যই থাকত। কিন্তু 'রাজপুত' হওয়া অস্বাভাবিক নয় কারণ সেইসময় জৌনপুরের পার্শ্ববর্তী অঞ্চলে রাজপুতদের স্বাধীন অস্তিত্ব ছিল। তবে লেখটির সামগ্রিক বক্তব্যে নিরিখে বিবেচনা করলে রা বলতে ক্ষত্রিয়, কৃষক সম্প্রদায় বা প্রভূত ভূসম্পত্তির অধিকারী কোনো ব্যাক্তি বলা অধিক যুক্তিযুক্ত।[২২]

আলোচ্য লেখটি প্রাচীনভারতে প্রাপ্ত ইষ্টকে খোদিত একমাত্র ঋণদান চুক্তিপত্র, তাই প্রাচীন ভারতের প্রেক্ষাপটে লেখটির গুরুত্ব অসামান্য। এছাড়া ২২৫০ টি 'ষডবোড্ডিক দ্রম্ম' মুদ্রার উল্লেখ লেখটিকে এক অনন্য মর্যাদায় ভূষিত করে, কারণ এটি একমাত্র লেখগত সাক্ষ্য যেখানে নির্দিষ্ট কোনো দ্রম্মের উল্লেখ রয়েছে, ইতিপূর্বে অন্য কোন তথ্যসূত্রে 'ষডবোড্ডিকদ্রম্ম' শব্দটির উল্লেখ পাওয়া যায়নি, তাই লেখটি অত্যন্ত মূল্যবান নথি হিসাবে গুরুত্বপূর্ণ। আমরা জানি, দ্রম্ম প্রাচীন ও মধ্যযুগীয় ভারতে একটি জনপ্রিয় মুদ্রা ছিল। সর্বসম্মতিক্রমে বলা যায়, গ্রীক শব্দ 'দ্রাখম' এর সংস্কৃত প্রতিশব্দ 'দ্রম্ম'। গ্রীক শাসকরা ব্যাকট্রীয় গ্রীক ও তার পার্শ্ববর্তী অঞ্চলের জন্য 'atticStanderd' ব্যবহৃত করত (৬৬-৬৭.২ গ্রেণ) এই মুদ্রাগুলির নাম ছিল দ্রাখম। কিন্তু হিন্দুকুশের দক্ষিণে ভারতীয় উপমহাদেশে যেহেতু কার্যাপণ প্রচলিত ছিল, তাই ওই অঞ্চলে আধিপত্য বিস্তারের পর ইন্দোগ্রীক রাজারা মুদ্রার মানের ভারসাম্য বজায় রাখতে তাদের ওজন কমিয়ে আনে (১ দ্রাখম=৪৩.২ গ্রেণ)। দ্রাখম ব্যতিরেকে অন্য যেসকল মুদ্রা প্রচলিত ছিল সেগুলি ছিল টেট্রাদাখম (৪xদ্রাখম), হেমিদ্রাখম (১/২ xদ্রাখম) ও ওবোল (১/৬x দ্রাখম)। আবার গ্রীকদের তাম্রমুদ্রায় একক ছিল চ্যালকন (৮ চ্যালকন= ১ ওবোল এবং ৪৮ চ্যালকন= ১ দ্রাখম)। কিন্তু ভারতবর্ষে প্রচলিত তাম্রমুদ্রার একক ছিল Pana (১৪০ গ্রেণ) তার সাথে সামঞ্জস্য রাখতে গ্রীকরা ভারতীয় ভূখন্ডে ৭০ গ্রেণকে চ্যালকনের ওজন ধার্য করে যা পণর ঠিক অর্ধেক। তবে গ্রীক মুদ্রা দ্রাখম রৌপ্য হলেও ভি.এস.আগরওয়ালের মতে, ষডবোডিক দ্রম্ম ছিল ছোট আয়তনের তাম্রমুদ্রা, যার মূল্য ছিল ছয়টি বোডিকর সমমূল্যের। তবে দ্রম্ম মুদ্রাগুলি নির্মাণের ধাতু নিয়ে মতভেদ রয়েছে, সে বিষয়ে পরবর্তীতে আলোচনা করব প্রথমে ষডবোড্ডিক দ্রম্ম মুদ্রার তৌলমান সম্পর্কে সঠিক ধারণা লাভ করা জরুরী, এই বিষয়টি সঠিকভাবে অনুধাবন করতে নিম্নে তালিকা প্রদান করা হল-

১ কর বা কৌড়ি= ১ গন্ডা

৫ গন্ডা= ১ বুরি

৪ বুরি= ১ পণ

১৬ পণ= ১ কাহাওয়ান

উপরিউক্ত তালিকাতে প্রদত্ত বুরি বলতে বোডিককে বোঝানো হয়েছে ১ বোডিক, ২০ টি কৌড়ির সমমূল্যের। আবার একটি বুরি বা বোডিকএক পণের সমান। আবার এক চতুর্থাংশ পণকে কাকিণীও বলা হয়, যা ২০ টি কৌড়ির সমান, সুতরাং সিয়াবোণী লেখতে পূর্বেই উল্লেখিত হয়েছে বোডিক কাকিনীয় মতোই একটি মুদ্রা যা ২০০ কৌড়ির সমান। ভি.এস.আগরওয়ালের মতে ষডবোড্ডিক দ্রম্ম ১ ১/২ পণ অথবা ১২০ টি কৌড়ির সমমানের। যেহেতু ১৬ পণ, এক ফাথাওয়ানের বা এক কার্ষাপণের সমান, তাই বলা যায় ষডবোড্ডিক দ্রম্ম এর মূল্য অবশ্যই রৌপ্য কার্ষাপণের ৩/৩২ অংশ। এল.গোপালের মতে, যদি উপরিল্লিখিত মতটি গ্রহণ করা হয়, তাহলে এই দ্রম্ম মুদ্রাগুলি নিঃসন্দেহে একটি মুদ্রার সাধারণ প্রতিশব্দ। আলেকজান্ডার কানিংহাম বলেছেন, বোড্ডিক, পাডিক বা ১/৪ পণ, প্রাচীন ভারতীয় কর্ষের (১ কর্ষ=১১.২ গ্রেণ) সাথে সংযুক্ত। একারণবশতঃ ষডবোড্ডিক মুদ্রার তৌলমান ১১.২ গ্রেণx ৬= ৬৭.২ গ্রেণ এবং বিবেচনা করা হয় এই মুদ্রাগুলি সেইসময়কার গাধাইয়া মুদ্রাগুলির সঙ্গে অভিন্ন। ভাস্করের লিলাবতী গ্রন্থানুসারে, ৪ কাকিণী= ১ পণ এবং ১৬ পণ= ১ দ্রম্ম অর্থাৎ চর্তুঃবোড্ডিক দ্রম্ম বলতে ১৬x৪=৬৪ টি বোডিক বোঝায়, আবার ষডবোড্ডিক দ্রম্ম বলতে ১৬x৬=৯৬ টি বোডিককে বোঝায়। শ্রীধরা চার্যের 'গণিতসার' ভাষ্যটি অনুসারে এল.গোপাল বলেছেন, ষডবোড্ডিক দ্রম্ম নামে একটি মুদ্রা ছিল। আবার তিনি দেখিয়েছেন যে, ৪৮-৭০ গ্রেণ ওজনের ইন্দো সাসানীয় মুদ্রার মধ্যে বেশি তৌলমানের মুদ্রাগুলি ষডবোডিক দ্রম্মকে উপস্থাপিত করে।[২৩]

এই ষডবোড্ডিক দ্রম্ম মুদ্রাটি নির্মাণের ধাতু নিয়ে বিভিন্ন পন্ডিত ভিন্ন মত পোষণ করেছেন। সাধারণ দৃষ্টিতে গ্রীক দ্রাখম রৌপ্যমুদ্রা হওয়ার দরুণ, ষডবোড্ডিক দ্রম্ম মুদ্রাকে রৌপ্য ধাতু দ্বারা নির্মিত বলা অধিক যুক্তিযুক্ত। কিন্তু মৃচ্ছকটিকে বোডিককে তাম্র মুদ্রা হিসাবে শনাক্ত করা হলে এ নিয়ে সংশয় সৃষ্টি হয়েছে। দ্রম্ম যে তাম্রমুদ্রা ছিল তার স্বপক্ষে যুক্তিপ্রদান করতে, ক্যানিংহাম দেখিয়েছেন যৌধেয় তাম্র মুদ্রায় দ্রম্ম শব্দটির উল্লেখ রয়েছে এবং ভি.এ.স্মিথ যৌধেয় মুদ্রায় উৎকীর্ণ লেখটির পাঠ প্রদান করেছেন 'devasya dramma bra। এদের বক্তব্যের বিপক্ষে আর.সি.আগরওয়াল মত পোষণ করে বলেছেন যৌধেয় তাম্রমুদ্রায় দ্রম্ম শব্দটির উল্লেখ অসম্ভব। কানহেরী লেখতে খোদিত রয়েছে বৌদ্ধভিক্ষুদের ১২০ কাঞ্চনদ্রম্ম দান করা হয়েছিল। ভান্ডারকার, স্মিথ, আলতেকার প্রভৃতি ব্যক্তি সহমত হয়ে বলেছেন, এই কাঞ্চন দ্রম্ম চান্দেল্য, গাহড়ওয়াল, কলচুরি রাজাদের স্বর্ণমুদ্রা। আবার পারূথক দ্রম্মমুদ্রা ছিল রৌপ্যধাতু পট্টাবৃত্তস্বর্ণমুদ্রা। বি.জে.সন্দেসর মত প্রদান করেছেন, দ্রম্ম বৃহত্তম মানের স্বর্ণ অথবা রৌপ্যমুদ্রা, তবে এর মান সঠিকভাবে নির্ধারণ করা কঠিন। এপ্রসঙ্গে ভি.ভি.মিরাশি বলেছিলেন,দ্রম্ম যে স্বর্ণমুদ্রা ছিল সে সম্পর্কে সঠিক কোনো প্রমাণ নেই। চতুর্থ গোবিন্দর 'কাম্বে তাম্রশাসনে' উল্লেখিত হয়েছে, দ্রম্ম ও রূপক ছিল রৌপ্যমুদ্রা। শিলাহারদের ও যাদবদের লেখগত সাক্ষ্য অনুযায়ী, দ্রম্ম বলতে স্বর্ণ ও রৌপ্য মুদ্রাকে বোঝানো হয়েছে। ভগবান লাল ইন্দ্রজি দ্রম্মকে রৌপ্য গাধাইয়া মুদ্রা নামে খ্যাত বিশেষধরণের বিবৃত সাসানীয় মুদ্রার সাথে শনাক্ত করেছেন। ১২২৮ সম্বাতে উৎকীর্ণ 'মেওয়ারের ধোড লেখতে', 'অজয়দেব দ্রম্মকে' রৌপ্যমুদ্রা হিসাবে বর্ণনা করা হয়েছে। কানাড়া ভাষাভাষী অঞ্চলে প্রাপ্ত 'বেল্লিয় দ্রম্ম' নামক মুদ্রার উল্লেখ করা হয়েছে, বেলিয় শব্দের অর্থ রৌপ্য। মেরুতুঙ্গের রামচন্দ্র দিনলালের 'প্রবন্ধ চিন্তামণিতে', 'রুপিয়ক দ্রম্ম' মুদ্রাকে রৌপ্যমুদ্রা বলা হয়েছে। এছাড়াও ক্যানিংহাম বলেছেন, 'আদিবরাহ দ্রম্ম' মুদ্রা রৌপ্য ও তাম্র উভয় ধাতুর দ্বারাই নির্মিত হত। বি.বি.বিদ্যাবিনোদ বলেছিলেন, ভারতীয় যাদুঘরে ও বরোদা সংরক্ষণাগারে ষডবোড্ডিক ধরণের কিছু

তাম্রমুদ্রা সংরক্ষিত রয়েছে। এ.এস.আলতেকার বলেছেন, এধরণের মুদ্রা সাধারণ রৌপ্য ধাতু দ্বারা নির্মিত হত। আর.সি.কর বলেছেন, এই মুদ্রাগুলি আসলে তাম্রধাতু দ্বারা পট্টাবৃত্ত রৌপ্যমুদ্রা। তৎসহ আলতেকার উল্লেখ করেছেন, অহিচ্ছত্র মুদ্রাভান্ডার ও লক্ষ্ণৌ মিউজিয়াম থেকে দুশোটির ও অধিক আদিবরাহ ও বিগ্রহপাল মুদ্রা পাওয়া গেছে কিন্তু তার মধ্যে কোনো তাম্রমুদ্রা ছিল না। লেখপদ্ধতি ও খরতরগচ্ছ পট্টাবলিতে উল্লেখিত হয়েছে, 'দ্বিবল্লক দ্রম্ম' মুদ্রা ছয়রতি তৌলমানের ধাতু দ্বারা নির্মিত। মুসলিম শাসকরা গুজরাট, রাজস্থান, সৌরাষ্ট্রে প্রথম মুদ্রা জারি করেছিল, কারণ সেসময় তারা এই সমস্ত অঞ্চল শাসন করতেন। আর.সি.আগরওয়াল এর মতে দ্বিপল্লব দ্রম্ম বলতে দুটি ধাতুর মিশ্রমুদ্রাকে বোঝানো হয়েছে, যেখানে রৌপ্য ও তাম্র ধাতু যথাক্রমে ১:২ অনুপাতে সংশ্লিষ্ট। তবে সামগ্রিক আলোচনার নিরিখে বলা যায়, দ্রম্মকে নির্দিষ্টভাবে রৌপ্য মুদ্রা বলা হলেও রৌপ্যধাতু ব্যতীত অন্য ধাতু দ্বারাও দ্রম্ম মুদ্রা নির্মিত হত, এছাড়া বলা যায়, কিছু ক্ষেত্রে দ্রম্ম তাম্র ধাতু দ্বারা পট্টাবৃত্ত রৌপ্যমুদ্রা হতেও দেখা যায়। এই ষডবোডিক দ্রম্ম গাধাইয়া মুদ্রার সমমূল্যের বলা অধিক যুক্তিযুক্ত।

এ প্রসঙ্গে বিশেষভাবে উল্লেখ্য, ইলতুতমিস তাঁর রাজত্বকালের সূচনায় আরবী মুদ্রার অনুকরণে ১৭৫ গ্রেণ ওজনের রৌপ্য মুদ্রা চালু করেছিলেন। কিন্তু পরবর্তীকালে রৌপ্য দোভাষী মুদ্রা দিরহাম, মামেলুক, টঙ্কা ও অধিক খাদমিশ্রিত তাম্রমুদ্রা জিতল চালু করেছিলেন ও তাম্রমুদ্রা আদিল (৮ গ্রেণ) জারি করেছিল। এই মুদ্রাগুলির তৌলমান সময়ানুক্রমে পরিবর্তিত হত। সাধারণত টঙ্ক মুদ্রার মান হত ১৭২.৮ গ্রেণ। তবে বিভিন্ন তৌলমানের টঙ্ক রৌপ্যমুদ্রা আবিষ্কৃত হয়। যথাক্রমে ১৭২.৮x১/২= ৮৬.৪ গ্রেণ, ১৭২.২x ১/৩= ৫৭.৬ গ্রেণ, ১৭২.৮x১/৬= ২৮.৮ গ্রেণ, ১৭২.৮x ১/১২= ১৪.৪ গ্রেণ। আবার একটি স্বর্ণ টঙ্ক মূল্য দশটি রৌপ্য টঙ্ক মুদ্রার সমান। মিশ্রধাতুর মুদ্রা ১ টি জিতল এর তৌলমান সাধারণত ৫৭ গ্রেণ হত এরসাথে ৩.৬ গ্রেণ রৌপ্য মিশ্রিত হত। অর্থাৎ ১৭২.৮x ১/৪৮= ৩.৬ গ্রেণ। তাম্রমুদ্রা আদিল বা ফ্যালস এর তৌলমান সাধারণত ৭১ গ্রেণ হত। আবার একটি জিতলের মূল্য ৪ টি তাম্রমুদ্রা আদিল বা ফ্যাসল এর সমান (১ জিতল= ৪x৭২ গ্রেণ)।[২৪]

তবে আলোচ্য ইষ্টক লেখটি ইলতুতমিসের রাজত্বকালে খোদিত হলেও, তাঁর জারিকৃত বা মুসলিম শাসকদের প্রচলিত মুদ্রার কোনো উল্লেখ নেই। তাই এথেকে সাক্ষ্য নিয়ে বলা যায়, জৌনপুর অঞ্চলে স্বাধীনভাবে রাজপুত রাজারা নিজেদের স্বতন্ত্র মুদ্রা জারি করেছিলেন সুতরাং জৌনপুর কেন্দ্রীয় শাসনের অন্তর্ভুক্ত ছিল না এবং সেইসময় জৌনপুর প্রাদেশিক এক গুরুত্বপূর্ণ স্বাধীন রাজ্য হিসাবে বিকাশ লাভ করেছিল।

লেখতে উল্লিখিত হয়েছে, ঋণদাতা বন্ধকী জমিটির শস্য, ফসল উপভোগ করবে। কিন্তু প্রত্যেক ভূমির ওপর একটি নির্দিষ্ট কর আরোপিত হয় ও শস্য উৎপাদনের জন্য নির্দিষ্ট রাজস্ব প্রদান করতে হত। তবে আলোচ্য লেখটির বন্ধকী ভূমিটির রাজস্ব ঋণদাতা না ঋণগ্রহীতা প্রদান করবে স্পষ্টভাবে লেখতে তা উল্লিখিত হয়নি। তবে রাজকীয় তত্ত্বাবধানে লেখটি খোদাই করার জন্য সম্ভবত জমিটির রাজস্ব মকুব করা হয়েছিল, তবে নির্দিষ্ট প্রমাণের অভাবে নিশ্চিতভাবে কিছু বলা সম্ভব নয়। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য ইলতুতমিস তাঁর রাজত্বকালে তুর্কি অভিযানের পূর্বে ভারতে প্রচলিত রাজস্ব ব্যবস্থা বহাল রেখেছিলেন। ভাগা এই রাজস্বব্যবস্থায় ভূমিরাজস্ব হিসাবে কৃষক তার উৎপাদনের ১/৬ অংশ কর হিসাবে প্রদান করত।[২৫] এই রাজস্ব ঋণগৃহীতা বা ঋণদাতা যিনিই প্রদান করুক উক্ত নির্দিষ্ট রাজস্বই প্রদান করতে হত। তবে তাঁর পরবর্তীকালীন দিল্লির সুলতানদের রাজত্বকালে অর্থনৈতিক পরিবর্তন হয়েছিল এবং নগদ টাকায় ভূমিকর প্রদানের বাধ্যবাধকতা জারি করা হয়েছিল।

আলোচ্য ঋণদান পত্রটির লেখন বৈশিষ্ট্য বা গঠন পদ্ধতি নিরীক্ষণ করলে অনুমিত হয়, তৎকালীন সময়ে এইরকম নির্দিষ্ট পদ্ধতিতে ঋণদানপত্র রচিত হত। যেমন প্রাচীনভারতে তাম্রশাসন জারিকরার একটি নির্দিষ্ট পদ্ধতি ছিল। বর্তমান ঋণদানপত্রটির ক্ষেত্রে এমত প্রযোজ্য। প্রথমত, মঙ্গলসূচক শব্দ দিয়ে লেখটি সূচিত হত, দ্বিতীয়ত, ঋণদানের সময়কাল ও স্থান তৃতীয়ত, ঋণদাতা ও ঋণগ্রহীতার পরিচয়। চতুর্থত, ঋণবাবদ প্রদত্ত অর্থের পরিমান ও বিনিময় ঋণগ্রহীতা কর্তৃক জমিবন্দকের বিষয়টি। পঞ্চমত, সমস্ত শর্ত মেনে নেওয়ার দরুণ ঋণগ্রহীতার সাক্ষর। ষষ্ঠত, এই চুক্তিপত্রের সুরক্ষা বিধানের জন্য রাজকীয় কর্তৃপক্ষ বা প্রাদেশিক শাসক কর্তৃক জারি করা আইন ও তাঁর নাম পরিচয়। সপ্তমত, রাজা কর্তৃক প্রদত্ত সমস্ত শর্তের অধীনস্ত ঋণদানপত্রটির সাক্ষীদানকারী বা ঋণগ্রহীতার জামানতকারী ব্যক্তিদের নাম ও পরিচয়। অষ্টমত, খোদাইকারকের নাম ও পরিচয়। এই নির্দিষ্ট গঠন পদ্ধতি থেকে অনুমিত হয়, রাজকীয় কর্তৃপক্ষের তত্ত্বাবধানে তৎকালীন সময়ে নিয়মিত ঋণদান হয়। এইরকম সুগঠিত লেখর বিন্যাস দেখে মনে করা হয় এই ঋণদানপত্রটি একটি নির্দিষ্ট রীতিতে বা পদ্ধতিতে উৎকীর্ণ করা হয়েছিল।

আলোচ্য ইষ্টক লেখটি আরও একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় সম্পর্কে আমাদের অবগত করে। সেটি হল যেহেতু সিক্ত থাকাকালীন ইষ্টকে লেখ খোদিত হত এবং আলোচ্য ঋণদানপত্রটি সকলের উপস্থিতিতে উৎকীর্ণ করা হয়েছিল তাই মনে করা হয় এই ঋণদানপত্রটি খোদাই করার জন্যই বিশেষভাবে ইষ্টকটি নির্মিত হয়েছিল রাজকীয় তত্ত্বাবধানে। সুতরাং তৎকালীন সময়ে এই ভাবেই একই রীতিতে ঋণদানপত্র বা বন্ধকনামা রচিত হত বলে অনুমিত হয়। আলোচ্য ইষ্টক লেখটির সামগ্রিকভাবে পর্যালোচনার পর দৃষ্ট হয় উক্ত লেখটির সংস্পর্শে আদি-মধ্যকালীন ভারতবর্ষের বিভিন্ন দিক আলোক উজ্জ্বল হয়ে ওঠে, তাই আলোচ্য ঋণদানপত্রটি প্রাচীন ভারতের ইতিহাস পুনর্গঠনে উল্লেখযোগ্য উপাদান হিসাবে বিবেচ্য।

তথ্যসূত্র:

১। Richard. Salomon, *Indian Epigraphy.* Munshiram Manoharlal Publishers Pvt Ltd, 1996, P- 126-130.

২। T.N. Mishra, Ancient Indian Bricks and Brick Remains, Harman Publishing house, New Delhi, 1997, P- 24.

৩। N.P. Chakravarti, *"Two Brick inscription from Nalanda" Epigraphia IndicaVol-XXI,* New Delhi, 1931-32, P- 193-195.

৪। Cunninghum*, Alexander., Archaeological Survey of India: Annual Report Vol-*V, 1872-73, Calcutta, 1875, P- 97.

৫। ibid., P- 103.

৬। ibid., P- 97-98.

৭। ibid., P-98-99.

৮। Agrawala, V.S., *India as known to Panini,* University of Lucknow, 1953, P- 53 & 64.

৯। Dhilon, B.S., *History and Study of the Jats*, Beta Publishers, 1994, P- 104.

১০। Cunninghum, Alexander., *The Ancient Geography of India*, Trubrer and Co, Paternoster, London, 1871, P- 203-207.

১১। Cunninghum, A., *Archaeological Survey of India Annual Report*, op,cit P- 99-101.
১২। ibid., P-102.
১৩। ibid., P-102.
১৪। ibid., P-102.
১৫। ibid., P-103.
১৬। Agrawala, V.S.,*"Jounpur Brick inscription", The Journal of United Province ofHistorical Society Vol-XVIII*, Part-I & II, 1945, P-196.
১৭। J.Thomas.,*Journal of Asiatic Society of Bengal*, Vol-XIX, Baptistmisson Press, Calcutta, P- 454.
১৮। Agrawala, V.S., op.cit, P-198.
১৯। চন্দ্র, সতীশ। মধ্যযুগের ভারত (প্রথম খন্ড)। সুলতানি আমল থেকে মুঘল আমল দিল্লি সুলতান (১২০৬-১৫২৬), বুকপোস্ট পাবলিকেশন, কলকাতা, ২০১৩, পৃষ্ঠা-৩১।
২০। Habibullah, A.B.M., *The Foundation of Muslim Rule in India*, Central Book Depot, Allahabad, 1967, P. 234-242.
২১। গুপ্তা, পরমেশ্বরী। লাল। পূর্বোক্ত, পৃষ্ঠা-৯৭।
২২। Agrawala, V.S., op. cit, P- 198.
২৩। ibid, P- 200-201.
২৪। Habibullah, A.B.M., op.cit, P- 265-271.
২৫। চন্দ্র, সতীশ। পূর্বোক্ত, পৃষ্ঠা- ১২৭-১২৮।

চিত্র

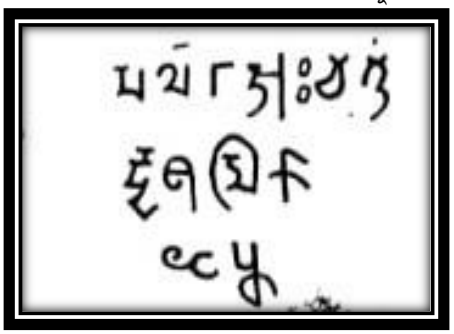

প্রথম শোরকোট ইষ্টক লেখ

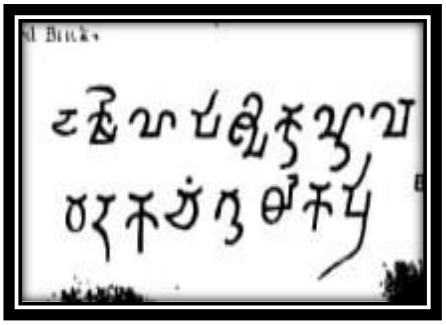

দ্বিতীয় শোরকোট ইষ্টক লেখ

তৃতীয় শোরকোট ইষ্টক লেখ

চতুর্থ শোরকোট ইষ্টক লেখ

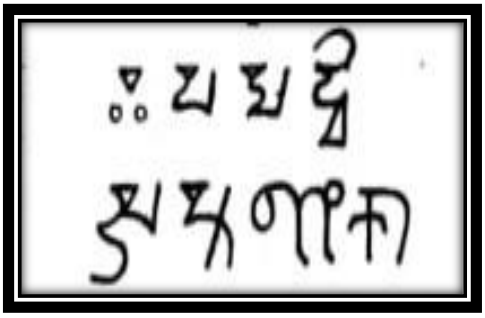

পঞ্চম শোরকোট ইষ্টক লেখ

জৌনপুর ইষ্টক লেখ